নারীশিক্ষা ও বিবেকানন্দ

অধ্যাপক অর্পিতা দাস

নারী-পুরুষের সম্মিলিত সহাবস্থানের ফলে গড়ে ওঠে একটি সুস্থ সমাজ। পৃথিবীর উন্নত ও উন্নয়নশীল প্রতিটি দেশের মনীষী ও চিন্তাবিদরা তাই সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে নারীকে দেখার কথা বলেছেন, তাঁদের উপযুক্ত সম্মান ও মর্যাদা দেওয়ার কথা বলেছেন। প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার দিকে তাকালেও দেখা যায় হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রে স্ত্রীশিক্ষাকে সমর্থন জানানো হয়েছে। বৈদিক যুগে মেয়েরা শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের অধিকারী ছিলেন। পুরুষদেরসঙ্গে সমানাধিকারে তাঁরা ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন। এমনকি উপনিষদের যুগেও নারীর মর্যাদা ছিল অক্ষুণ্ণ। সেই কারণে প্রাচীন ভারতে মৈত্রেয়ী, গার্গী, রুক্মিনী, লীলাবতী প্রমুখ বিদুষী নারীর কথা জানা যায়।

কিন্তু স্মৃতি ও পুরাণের যুগ থেকে নারীকে অবজ্ঞার চোখে দেখা হতে লাগল। যদিও স্মৃতিকার মনু বলেছেন — "কন্যাপেবং পালনীয়া / শিক্ষানিয়েতি যত্নত ইত্যাদি।।" মনু আরও বলেছিলেন — "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্ত দেবতাঃ।" অর্থাৎ কন্যাকে যত্নপূর্বক শিক্ষাদান ও পালন করা উচিত। যেখানে নারীরা পূজিতা, সেখানেই দেবতারা আনন্দলাভ করেন। তা সত্ত্বেও বৈদিক যুগের মতো নারীরা আর সমাজে সেভাবে স্বাধীনতা ও মর্যাদা পেতেন না। সমালোচকের কথায় — "... অন্যান্য স্থলে দশবিধ সংস্কারের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য আর ছিল না। গৃহে মর্যাদা যদিবা থেকে থাকে, সমাজে কিছুই ছিল না। স্মৃতি-পুরাণাদির রচয়িতা পুরুষ এবং যত প্রকারে সম্ভব গৃহের স্ত্রী-স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখবার জন্য নারীকে যতটা সম্মান বা মর্যাদা দেওয়া প্রয়োজন তার বিন্দুমাত্র বেশী দেননি। স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতার প্রশ্নই ওঠে না।"[১] এইভাবে সমাজে নারী-স্বাধীনতা ক্রমশ হ্রাস পেতে শুরু করেছিল।

ত্রয়োদশ শতকে বাংলাদেশে মুসলমানদের আধিপত্য বিস্তার নারী-শিক্ষা ও নারী-স্বাধীনতার পথকে করে তুলেছিল প্রায় রুদ্ধ। প্রাবন্ধিক গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের দৃষ্টিভঙ্গি এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য — "... গৌড়ে আর হিন্দুস্থানের কতক দেশে বহুকাল যবনাধিকার হওয়াতে এবং তাহাদের দৌরাত্ম্যের নিমিত্তে লোকসকল মহাশঙ্কিত হইয়া আপন আপন পরিজনকে অতি সংগোপনে রাখিত। বিদ্যাতে কি সৌন্দর্য্যে কাহারও নাম প্রকাশ হইলে দুরাত্মা যবন তাহার উপর অত্যাচার করিত, এই ভয়ে আপন আপন পরিজনের নাম যাহাতে অপ্রকাশ থাকে, তাহার চেষ্টা সর্ব্বদা করিত।"[২] তা সত্ত্বেও মধ্যযুগের বাঙালি সমাজে জাহ্নবাদেবী, চন্দ্রাবতী, সীতাদেবী, হেমলতা দেবী প্রমুখ শিক্ষিতা নারীর কথা জানা যায়। অষ্টাদশ শতক ও উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ইংরেজ আমলে বাঙালি সমাজে স্ত্রীশিক্ষা সেভাবে প্রচলিত না থাকলেও দু'চারজন বিদুষী মহিলার কথা জানা যায়। শ্যামমোহিনী দেবী, গঙ্গামণি দেবী, আনন্দময়ী দেবী এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এইসময় অভিজাত পরিবারে বাড়ির মধ্যে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ থাকলেও বিদ্যালয়ে গিয়ে লেখাপড়া করার

সুযোগ মেয়েরা পেতনা। তাই স্ত্রীশিক্ষা সেসময় সমাজে ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করেনি। এই সময়ে মেয়েরা হয়ে উঠেছিল গৃহবন্দি এবং বিভিন্ন কু-প্রথা ও অর্থহীন আচার-আচরণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

কিন্তু উনিশ শতকে এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রসার লাভ করতে থাকে. সেই শিক্ষায় শিক্ষিত, মুক্তচিন্তা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ মেয়েদের স্বাধীনতা দান ও বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে উদ্যোগ নেন। এক্ষেত্রে খ্রিস্টান মিশনারীরাও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত মেয়েদের স্বাধীনতা ও সামাজিক মর্যাদা ছিলনা বললেই চলে।

১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে ১২ জানুয়ারি এরকমই এক সামাজিক পরিমণ্ডলে নরেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতার সিমলা অঞ্চলের ৩নং গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের কলকাতা হাইকোর্টের বিখ্যাত অ্যাটর্নি বিশ্বনাথ দত্তের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন বহু ভাষাবিদ এবং ধর্ম বিষয়ে উদার মনের মানুষ। 'বাইবেল' ও 'দেওয়ান-ই-হাফিজ' ছিল তাঁর প্রিয় বই। স্বাধীনচিন্তার অধিকারী এই মানুষটি বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছিলেন। পিতা বিশ্বনাথ দত্তের মুক্তচিন্তার দ্বারা নরেন্দ্রনাথও প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর ছেলেবেলাকার বিভিন্ন ঘটনায় এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে নরেন্দ্রনাথের জীবনে ব্যাপক পরিবর্তনের সূত্রপাত ঘটে। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসার পর থেকেই। শিব জ্ঞানে জীবসেবা করার যে মন্ত্র তিনি রামকৃষ্ণদেবের কাছ থেকে পেয়েছিলেন তা হৃদয়ে ধারণ করে একদিন পিতামহ দুর্গাপ্রসাদ দত্তের মতো সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন। আর সেই সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ পরিচিত হন স্বামী বিবেকানন্দ নামে।

বিবেকানন্দ তাঁর গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিষয় আলোচনার পাশাপাশি সমাজ ও দেশগঠনের কাজেও উদ্যোগী হন। এক্ষেত্রে জাতীয় জীবনের জাগরণে তিনি দেশের তরুণ সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করতেন এবং তাদের দেশগঠনের কাজে এগিয়ে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। শুধু যুব সম্প্রদায়ই নয় দেশের সামগ্রিক উন্নতিতে পুরুষদের মতো নারীদেরও বিশেষ ভূমিকা আছে বলে তিনি মনে করতেন — "... একপক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।"[৩] অর্থাৎ দেশের উন্নতিতে তিনি নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টার কথায় বলতে চেয়েছিলেন। জাতীয় জীবনের উন্নতিতে নারীদের ভূমিকা ও আদর্শ কেমন হবে সে সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিচয় দিয়েছেন — "ভারতীয় নারী-গণের যে রূপ হওয়া উচিত, সীতা তাহার আদর্শ; নারী চরিত্রের যত প্রকার ভারতীয় আদর্শ আছে, সবই এক সীতাচরিত্র হইতেই উদ্ভূত; আর সমগ্র আর্যাবর্তে এই সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ তিনি আবালবৃদ্ধবণিতার পূজা পাইয়া আসিতেছেন। মহামহিমময়ী সীতা — সাক্ষাৎ পবিত্রতা অপেক্ষাও পবিত্রতরা, সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত আদর্শ সীতা চিরকালই এইরূপ পূজা পাইবেন। যিনি বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রদর্শন না করিয়া সেই মহা দুঃখের জীবন যাপন করিয়াছিলেন, সেই

Scanned by CamScanner